ড. আহমেদ আমিনুল ইসলাম

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে ভায়োলেন্সের স্বরূপ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র মাধ্যম বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত না হলেও মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ বর্ণিত জনমাধ্যম দুটির প্রায় আওতায় চলে এসেছে। মানব যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ মাধ্যম দুটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলমান সমাজব্যবস্থায় বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে বলে যোগাযোগকর্মী ও গবেষকদের ধারণা। গণমাধ্যমের উক্ত শাখা দুটিতে প্রদর্শিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কাহিনিচিত্রে ভায়োলেন্সের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। ইংরেজি violence-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'প্রচণ্ডতা'/'হিংস্রতা'/'সহিংসতা'/'হিংস্র আচরণ' প্রভৃতি। কোনো কোনো অভিধানে ভায়োলেন্সের অঙ্গীভূত বা সঙ্গী শব্দ-বন্ধ হিসেবে sex-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন Longman Dictionary of Contemporary English-এ ভায়োলেন্স শব্দটির সমার্থক শব্দ ও অর্থ বোঝাতে নিম্নরূপ বাক্যের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে : behavior that is intended to hurt other people physically. লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, উক্ত অভিধানে violence শব্দটি বোঝাতে যে বাক্যটি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার অনুষঙ্গে আরও একটি শব্দের সংযোজন রয়েছে। সংযোজিত শব্দটি হলো sex. অতএব দেখা যাচ্ছে যে, sex I violence দুটি শব্দ মিলিয়ে সেখানে উদাহরণ হিসেবে যে বাক্যটি গঠিত তা হলো : There is too much sex and violence shown on television. সুতরাং স্পষ্টত একথা বলা যেতে পারে যে, প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে কেবল 'ভায়োলেন্স' হিসেবে জানি তার অন্তর্গত উপাদান হিসেবে যৌনতা এবং অপরাধ প্রবলভাবে বিদ্যমান। কাহিনির প্রয়োজনে কিংবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাহিনিকে চিত্তাকর্ষকরূপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে চলচ্চিত্রে যৌনতা ও অপরাধ-দৃশ্যের নানামাত্রিক সমাপতন ঘটিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। ফলে যৌনতা ও অপরাধকে আশ্রয় করে এর সঙ্গী হিসেবে হত্যা-হিংসা-ধর্ষণসহ নানারূপ উপাদানের সমন্বয় টেলিভিশন বা চলচ্চিত্রে প্রকট আকারে দেখা যায়।

গণমাধ্যম

গণমাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তার নিরিখে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র সবার শীর্ষে। মাধ্যম দুটির এরূপ জনপ্রিয়তার কারণে একশ্রেণির অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র নির্মাতা স্ব-স্ব মাধ্যমে প্রদর্শনের জন্য বিনোদনের নামে বাণিজ্যিক-যোগাযোগ কৌশল হিসেবে তারা sex ও violence দুটির অনবরত মূর্তায়ন অর্থাৎ দৃশ্যায়ন করে চলেছেন। sex ও violence-সমন্বিত দৃশ্যবস্তু এবং তার উপস্থাপনায় নির্মাণকৌশলের প্রাযুক্তিক আকর্ষণ অনেককেই মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে। উল্লেখ্য, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমে বর্ণিত sex ও violence-নির্ভর অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্রের দর্শকের একটা বড় সংখ্যাই বয়সের হিসেবে তরুণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরও বটে। ফলে ভবিষ্যৎ সমাজজীবনে বর্তমানের টেলিভিশন বা চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রদর্শিত sex ও violence -জাত হত্যা-হিংসার প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে মনঃস্তাত্ত্বিকভাবে গণযোগাযোগ মাধ্যমের অন্যান্য শাখার মতো উপরোক্ত মাধ্যম দুটির ক্রিয়াশীলতা বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত। অধিকাংশ স্থলে দর্শকের মানবীয়-সত্তাকে অবলেপনের মাধ্যমে কেবল ভোক্তা-সত্তারূপে চিন্তার ফলে 'উৎপাদক' বা producer-দের সম্মুখে 'মানুষ' বা human being নিতান্তই এক অনুপস্থিত

ধারণামাত্র হয়ে পড়ায় টেলিভিশন অনুষ্ঠান বা চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্মাতাদের কাছে নীতি-নৈতিকতার বোধ মূল্যহীন হয়ে যায়। ফলে না মানুষ না সমাজ না রাষ্ট্রের কল্যাণে টেলিভিশন বা চলচ্চিত্র মাধ্যমে ভায়োলেন্স এবং তার অনুষঙ্গী হিসেবে হিংস্রতা, হত্যা ও যৌনতার প্রবল উপস্থিতি ঘটানো হয়। একটি গবেষণা সূত্র থেকে জানা যায়: '...children typically witness 32,000 murders and 40,000 attempted murders by the time they reach the age of 18.' উদ্ধৃতিটি আমেরিকান গবেষণার হলেও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বাংলাদেশের শিশু-কিশোররাও প্রায় অনুরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখায়। উল্লেখ বাহুল্য, এই শিশু-কিশোররাই বর্ণিত মাধ্যমে ভায়োলেন্স প্রত্যক্ষ করে তার অভিজ্ঞতা বহনের মাধ্যমে কালক্রমে পরিণত বয়সে উত্তীর্ণ হয়। ভবিষ্যতে অবচেতন স্তরে হলেও সেই স্মৃতির নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে বলে আমাদের ধারণা। এরূপ অপরাধচিত্রে অভ্যস্ত দর্শকরা যখন নতুন কোনো সমাজ গঠন করবে সেই সমাজকে নানারূপ সহিংস ঘটনারও যে সাক্ষ্য বহন করতে হবে তা গবেষকদের ধারণায় নিশ্চিতপ্রায়। ফলে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের সহায়তায় মানব যোগাযোগ সৃষ্টি বিষয়ে সচেতনতা জরুরি বলে বিবেচ্য। আবার উক্ত মাধ্যমসমূহে সৃষ্ট যোগাযোগ প্রক্রিয়ার যে মনোভঙ্গি বা মনঃস্তাত্ত্বিক পাঠ বা text বিনির্মাণ করে সে বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগ জরুরি।

চলচ্চিত্র একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রাব্য গণমাধ্যম। মাধ্যমগত চমৎকারিত্বই চলচ্চিত্র মানুষের নিকট ধনাত্মক (কখনোবা ঋণাত্মক) মনোভঙ্গিতে পৌঁছায়। এ হলো চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষের বাহ্য আকর্ষণ। মনে রাখা জরুরি যে, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমের অধিকাংশ দর্শকই শিশু ও কিশোর বয়স-গ্রুপের। একদিকে, এই বয়স গ্রুপের ছেলেমেয়েদের টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রতি কৌতূহল অত্যধিক। আবার অন্যদিকে, চলচ্চিত্র মাধ্যমের জাঁকজমক ও চমৎকারিত্বপূর্ণ কলাকৌশল বা স্পেশাল ইফেক্ট শিশু-কিশোরদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্তর্গতভাবে চলচ্চিত্রের বিষয়, সংলাপ, চিত্ররূপ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নৃতাত্ত্বিক আচার-আচরণ প্রভৃতি দর্শকরূপী শিশুরা যে ভঙ্গিতে (মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি) গ্রহণ করে তার সঙ্গে সমাজস্বীকৃত নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নটির পাঠও বর্তমান নিবন্ধের অনিবার্য অংশ। চলচ্চিত্র মাধ্যমে শিশুরা 'কী দেখছে'; 'কীভাবে দেখছে' এবং দেখবার পর তাদের মনোজগতে 'কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে'। অধিকন্তু এই মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের 'কীভাবে পর্দায় উপস্থাপন করা হচ্ছে তার সঙ্গে সমাজের প্রচল নিয়মনীতি, রুচি, সংস্কৃতি ও আচরণকে 'কীভাবে প্রভাবিত' করছে তা নিবিড় পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে।

সাধারণত সমাজ পরিপ্রেক্ষিতের নিরিখে ইতিবাচক চলচ্চিত্র উপভোগের ফলে মানুষের রুচি তৃপ্ত হয়, মার্জিত হয় আবার কখনো কখনো প্রথা ভাঙার সংগ্রামে প্রবলভাবে উদ্দীপিত এবং উত্তেজিতও হতে পারে। পক্ষান্তরে, নেতিবাচক চলচ্চিত্র ঋণাত্মকভাবে পরিণত বয়সি দর্শককে দিগভ্রান্ত করবার কৌশলী অপশক্তিও বহন করে। পর্দায় (প্রেক্ষাগৃহ কিংবা টেলিভিশনের) চলচ্চিত্র কাহিনির পাত্রপাত্রীদের যেসব 'ভাব-ভঙ্গি' কিংবা 'আচার-আচরণ' প্রদর্শন করা হয় তাকে বুদ্ধিসম্পন্ন পরিণত বয়সি দর্শক গ্রহণও করতে পারে, পারে বর্জন করতেও। শিশুদের সে ক্ষমতা কম। লক্ষণীয়, পর্দায় প্রতিফলিত চরিত্রসমূহের 'চলা-ফেরা', 'চাল-চলন', 'অঙ্গ-ভঙ্গি' এমনকি কাহিনিতে বর্ণিত আদর্শবোধের দ্বারা দর্শক অল্প সময়ের জন্য হলেও নিজেকে কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে সৃষ্টি করে নিতে পারে নতুন এক কল্পনার জগৎ। শুধু তাই নয়, উক্ত চরিত্র বা চরিত্রসমূহের ভাবাদর্শের সঙ্গে সকল শ্রেণির দর্শক নিজস্ব মনঃস্তাত্ত্বিক সংস্কৃতির প্রতিরূপটিও আবিষ্কার করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে, দর্শকের মানসিক পটভূমিতে চলচ্চিত্রের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় তার ভিতরকার মানবিক-সত্তাটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। কেননা, শিশু-কিশোরদের বাস্তববোধ ও চলচ্চিত্রোপলব্ধির বোধ পৃথক করবার ক্ষমতা সীমিত। আর এ কারণেই শিশু-কিশোর দর্শকদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় কেবল শিশু-কিশোরদের সমকালীন অবস্থা বিবেচনায় না রেখে ভবিষ্যতের ভাবনাটাও পরিচালকের ভেবে নেয়া উচিত। কারণ, ইতেপূর্বে প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে যে, শৈশবের স্মৃতিময় অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব তাদের পরিণত বয়সেও লক্ষণীয়রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরা জানি, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।' সুতরাং পরিণত বয়সে পরিণত কর্মোদ্যোগ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণে পরিণত ভাবনার স্ফুরণ যেন শিশু-কিশোরদের চলচ্চিত্রকর্মসহ জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে লক্ষ্য করা যায়। মূলত এ কারণেই জাতীয়ভাবে ব্যাপক কল্পনানির্ভর, উদ্ভাবনকুশলী এবং সৃষ্টিশীল প্রেরণা সঞ্চারী বিশেষত বিজ্ঞানমনস্ক শিশুতোষ চলচ্চিত্রের অনিবার্যতা।

সমাজ জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গ সমাজবিজ্ঞানী, যোগাযোগকর্মী, মনোবিজ্ঞানীসহ জ্ঞানকাণ্ডের সকল শাখার পণ্ডিতবর্গ মেনে নিয়েছেন। সমাজ যখন চলচ্চিত্রের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনে তখন এ ভাবনাও অমূলক নয় যে, সমাজ-অন্তর্গত জীবনস্তরের সকল গ্রুপই এর ভোক্তা। সুতরাং চলচ্চিত্রের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টিও কম গুরুত্বের নয়। প্রায় সকল শিক্ষিত সমাজে চলচ্চিত্রের ভোক্তা হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় শিশু-কিশোরদের অবস্থানও নিশ্চিত হয়ে আছে। প্রেক্ষাগৃহের বিশাল রুপালি পর্দায় না হলেও টেলিভিশন মাধ্যমের সহায়তায় চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সঙ্গে শিশু-কিশোরদের প্রতিনিয়তই যোগাযোগ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল রয়েছে। শিশু-কিশোরদের সাথে চলচ্চিত্রের এই যোগাযোগের নানামাত্রিক মিথস্ক্রিয়ার আলোচনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতও বর্তমান নিবন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের মৌল বিষয়।

নবজাত শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের লক্ষ্যে সৃষ্ট মাধ্যম প্রথমত কথা-বার্তা, শব্দ বা sound এবং দেহভঙ্গিমা, বস্তু বা figure-এর সঞ্চরণশীলতা বিশেষ উপাদান। কথা বা শব্দ উচ্চারণ এবং অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু সঞ্চরণশীলতা মাধ্যমে নবজাত শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি ফলপ্রসূ করবার জন্য আমরা আমাদের প্রমিত কিংবা দিনানুদৈনিকের ব্যবহৃত ভাষা এমনকি দেহভঙ্গির যথাসম্ভব পরিবর্তনপূর্বক শিশুর নিকট থেকে সাড়া আহ্বানের চেষ্টা করে থাকি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ এক স্বতন্ত্র ভাষা কাঠামো। মানবের সমাজবদ্ধ গোষ্ঠীজীবনের ইতিহাসের সমবয়সি এই প্রকারের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বর্ণিত ভাষা কাঠামোর ব্যবহার। শিশু যতই বেড়ে ওঠে ক্রমশ পরিণত বয়সের পানে ধাবমান হয় ততই তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাসীর যোগাযোগ-আচরণেরও অর্থাৎ উপরোক্ত ভাষা কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। আর ক্রমেই তা পরিপক্বতা অর্জন করতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত জীবনস্তরের ধাপে ধাপে শিশুর সঙ্গে মা-বাবা অর্থাৎ পরিবার বা সমাজের এবং সামাজিক বিচিত্রমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা নৈতিক দায়বোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সমাজ সৃষ্টি করে নেয়। ফলে শিশু-কিশোর কিংবা পরিণত কোনো মানুষের পক্ষেই যা-খুশি তাই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কোনো সমাজ তা মেনেও নেয় না। বলা যায় এ একধরনের সামাজিক সেন্সরশিপও বটে। ফলত শিশুর প্রাপ্য বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সাধারণত সমাজ সচেতন মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের চেষ্টা করে। কিন্তু এর ব্যত্যয় সমাজ এবং সামাজিক নানাবিধ প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কম লক্ষ্য করা যায় না। স্মর্তব্য যে, এরূপ ব্যত্যয় ঘটার পশ্চাতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বা গণমাধ্যমের ভূমিকাই প্রকারান্তরে সর্বাগ্রে স্বীকার্য। পারিবারিক যোগাযোগ, ছবি, বই-পুস্তক অর্থাৎ মুদ্রণ-যোগাযোগ, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রসহ অধুনা সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ প্রভৃতি যোগাযোগ-প্রক্রিয়ার ব্যাপক পরিমণ্ডলে পরিণত বয়সের মানুষের ন্যায় শিশুরাও সর্বদাই ভাসমান কিংবা এইসব মাধ্যমের আবেশায়ন প্রক্রিয়ার অধীন। তাই শিশুর যোগাযোগ সৃষ্টিকারী মাধ্যমের স্বতন্ত্র এবং শিশু-মনের গ্রহণোপযোগী প্রকাশ-মনোভঙ্গির প্রয়োজন।

পরিণত বয়সিদের মতো প্রজ্ঞাবান না হলেও শিশুরা নিজে নিজেই অনেকটা হয়তো মনের অবচেতন স্তরের পটভূমি থেকেই কবিতা, গল্প, ছড়া, ছবি এবং চলচ্চিত্র দেখার সময়ও দৃশ্য, সংলাপ ও ঘটনাপ্রবাহের অর্থ আকার এবং ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে যায়। তাদের সেই চেষ্টা সর্বত্র সফল নাও হতে পারে। কিন্তু যে কোনো মাধ্যমই শিশুতোষ মনোভঙ্গি বা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সৃজিত হলে শিশুরা যে সেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় না তার প্রমাণও আমাদের কাছে কম নেই। আমাদের দেশে যে স্বল্পসংখ্যক শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তা শিশুদর্শকরা সাদরেই গ্রহণ করেছে। তাদের যে গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় মিকি-মাউস, টম অ্যান্ড জেরি, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান, সুপারম্যান, স্কুবি ডু, পাপাই দ্য সেইলরম্যান, টুইটি, উইনি দ্য

পু, শ্রেক, হ্যারি পটার প্রভৃতি নানারূপ ও রীতির চলচ্চিত্রের প্রতি এদেশীয় শিশু-কিশোরদের দুর্নিবার আগ্রহদৃষ্টে।

বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০ থেকে ৬০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শন যে বিস্ময়কর একটি সংবাদ তাতে সন্দেহ করা চলে না। উল্লেখ্য, নির্মিত এসব চলচ্চিত্রে কাহিনির প্রয়োজনে শিশু চরিত্রের উপস্থাপন থাকা সত্ত্বেও তা মোটেই শিশুতোষ নয়। অধিকাংশই শিশুদের পক্ষে উপভোগও কষ্ট-কল্পনার শামিল। কেননা এ সমস্ত চলচ্চিত্রের অধিকাংশেই পাত্রপাত্রীর আচার-আচরণ, সংলাপ প্রক্ষেপণ এবং দৃশ্যায়ন কৌশল বিবেচনায় শিশুকে পরিণত বয়সের মানুষ থেকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার শিশুতোষ চলচ্চিত্রের অভাবে তথাকথিত 'সামাজিক' কিংবা 'সপরিবারে দেখার মতো ছবিসমূহ'ই এদেশের শিশু-কিশোরদের দেখতে হচ্ছে। কারণ এর বিকল্প ব্যবস্থা বা সুযোগ উভয়েরই অভাব আমাদের দেশে প্রকট।

আমাদের দেশে যেসব দৃশ্যবস্তু বা visual perspective-এর পরিপ্রেক্ষিতে শিশুকে উপস্থাপন করা হয় তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর যা রাষ্ট্র কিংবা জাতিসংঘ স্বীকৃত শিশু অধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। অধিকন্তু শিশুভোক্তা বা দর্শকের কাছেও এসব দৃশ্যাবলি সঙ্গতিবিহীনরূপে প্রতিভাত। আবার তা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রচল মূল্যবোধকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। গতানুগতিক বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রসমূহে শিশু-কিশোরদের বিকৃত এরূপ প্রতিচিত্র উপস্থাপনের পরিসংখ্যান নির্ণয় ভিন্নতর গবেষণার ক্ষেত্র উন্মোচিত করে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শ্রাব্য ও মুদ্রণ গণমাধ্যমে পুনঃপুন প্রচারের ফলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তথাকথিত 'সামাজিক চলচ্চিত্র' অভিধায় খ্যাত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত' চলচ্চিত্রেও শিশুর প্রতি অমানবিক, নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর এবং সমাজ-অসমর্থিত শিশু-আচরণের দৃশ্যরূপ সম্বলিত চলচ্চিত্রও কম দেখা যায় না। শিশুর প্রতি ভায়োলেন্স, সহিংসতা, হিংস্রতা প্রদর্শন, শিশুকে প্রহার, ভীতি প্রদর্শন, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যা বা হত্যা চেষ্টা বাংলাদেশের প্রচলিত চলচ্চিত্রের এক অনিবার্য বিধিলিপি। প্রকারান্তরে উল্লেখ্য, যেন এসব নির্মমতা ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণই অসম্ভব বিষয়। শিশুর প্রতি ভায়োলেন্স, সহিংসতা, হিংস্রতা প্রদর্শন ব্যতিরেকেও চলচ্চিত্র মাধ্যমে ব্যবহৃত সহিংসতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ এবং মানুষ হত্যার নির্মমতার প্রদর্শন শিশুর ন্যায় বয়স্কদেরও চিত্তের বিকার ঘটায়।

বাংলাদেশে বিদ্যমান জাতীয় শিশুনীতির আলোকে অবলোকন করতে গেলে লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত নীতিমালার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র সঙ্গে বর্তমান গবেষণাটি দূরান্বয়ী সম্পর্কে সামান্য হলেও সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ নীতিমালার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়াবলির মধ্যে শিশুর নৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গ স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, শিশুর বেঁচে থাকবার অধিকার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে তার স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শারীরিক নিরাপত্তা বিধান; সার্বিকভাবে মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে তার শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং নৈতিক, সাংস্কৃতিক-সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন; পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি বিধানে পদক্ষেপ গ্রহণ; বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; সকল জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষায় নীতি অবলম্বন এবং জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক কর্মকাণ্ডে শিশুর আইনগত অধিকার প্রভৃতি সংরক্ষণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, শিশুর নানারূপ অধিকারের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হলেও উক্ত নীতিমালায় গণমাধ্যমের সঙ্গে বিশেষত যোগাযোগ মাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের অধিকারের বিষয়টি তীব্রভাবে উপেক্ষিত বলে প্রতীয়মান। গণমাধ্যম বা যোগাযোগ মাধ্যম শিশুর সার্বিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। বিপরীত প্রক্রিয়ায় উক্ত মাধ্যমের বিরূপ প্রভাবও শিশুর নৈতিক, মানসিকসহ সার্বিক বিকাশে বিরূপ এবং নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে মূলধারার চলচ্চিত্রে ঘটনার আকস্মিকতা, নির্মমতা এবং তীব্রতা সৃষ্টির জন্য পরিণত বয়সের নর-নারীদের পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও কঠোর কঠিন আচরণ প্রদর্শন করা হয়। নানা ধরনের ভায়োলেন্সের সঙ্গে তাদের ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সম্মুখে মৃত্যুভীতি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও রোমান্টিক দৃশ্য নির্মাণ করতে গিয়ে শিশু-কিশোরদের মুখে এমন সংলাপ এবং দেহভঙ্গিমার আচরণ প্রদর্শনের প্রবণতা দেখানো হয়, যা কেবল পরিণত বয়সের প্রেমিক-প্রেমিকাদের দ্বারাই সম্ভব। উল্লিখিত বিষয়াবলি ব্যতীত ফর্মুলা চলচ্চিত্রের বহুসংখ্যক উদাহরণ দেওয়া যাবে যেখানে কাহিনির বিন্যাসে স্বামী ও শিশু পুত্র-কন্যার সম্মুখে (সকলের হাত-পা বাঁধা অবস্থায়) স্ত্রীর ধর্ষণ দৃশ্যসহ ভয়ঙ্কর নির্যাতনের দৃশ্য ধারণ করা হয়। আবার চলচ্চিত্র কাহিনির প্রোটাগনিস্ট চরিত্রকেও অনেক সময় শিশু-কিশোর চরিত্রের সম্মুখে এমন প্রচণ্ড হিংস্রতার সঙ্গে নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হয়, যা শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশকে ক্ষুণ্ন করে। উপরন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অবচেতন মনের গুপ্ত নেতিবাচক স্পৃহাকে দর্শকের নিকট যৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করবার পরিচালকের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন : 'খুনের বদলে খুন, রক্তের বদলে রক্ত' ঝরানোর অভিপ্রায় এদেশীয় চলচ্চিত্র কাহিনির জনপ্রিয় এক পন্থা বা ফর্মুলারূপে হামেশাই দেখা যায়। আমাদের বিবেচনায় এটি যে একপ্রকার ভ্রান্ত চলচ্চিত্রশৈলী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানবিক, সামাজিক কিংবা দেশাচারভেদ হিসেবে এরূপ চলচ্চিত্রকে ভ্রান্ত-শৈলীর নির্মিতি বললেও প্রতিষ্ঠিত ও প্রথাগত চলচ্চিত্রের প্রকৃতপক্ষে এ থেকে মুক্তি নেই।

আমরা জানি যে, কোনো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ঐ সমাজের মানুষের কাজ করবার প্রক্রিয়া বা ধরন, কথা বলবার ভঙ্গি সমাজের প্রচল যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রায় নির্দিষ্টই করে দেয়। যেমন- শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়ায়। প্রথম দর্শনে বয়স্করা সাধারণত যে ভাবভঙ্গিতে শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিশুদের ক্ষেত্রে তা একেবারেই যেন ভিন্ন। এ রীতি সমাজস্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। বলা যায় এসব নিয়মজনিত স্বভাব সামাজিকগণের ওপর অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থা আরোপ করে দেয়। এর ফলে একধরনের সেন্সরবোধ বা censorship সকলের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজবিচ্ছিন্ন একেবারেই স্বতন্ত্র কোনো আচরণ আমরা সহজে গ্রহণ করতে যেমন পারি না তেমন মেনে নেওয়াও কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যোগাযোগ প্রক্রিয়া সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে আবার সমাজব্যবস্থাও যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং চলচ্চিত্র নির্বিশেষে যে কোনো যোগাযোগ মাধ্যমকেই সমাজস্বীকৃত ন্যায় ও নীতিবোধ, সংস্কার ও সাংস্কৃতিক উপলব্ধি সকলের সম্মিলনে বিজ্ঞানমনস্কভাবে শিশু-কিশোর শ্রেণির নাগরিকের সম্মুখে উপস্থি হওয়া জরুরি। এজন্য সংশ্লিষ্ট মাধ্যমকর্মীর আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্যই ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত সম্যক ধারণার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন উক্ত সমাজের প্রতি গভীর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া।

গণমাধ্যমে ভায়োলেন্স : সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র বিষয়ে কোনোরূপ তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করতে গেলেই প্রচল ও পূর্বধারণাবশত সকলেই শিল্পছবি (art film) কিংবা বিদেশের প্রথিতযশা কোনো নির্মাতার নন্দনভাবনা, নির্মাণশৈলী এমনকি তৎসৃষ্ট চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মূল্যায়নকেই সাধারণত বিবেচনা করে থাকেন। আমাদের দেশে নির্মিত ও প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের আঁতেলেকচুয়াল ব্যাখ্যান বা discourse যেন হতেই পারে না। আবার, যারা এরূপ discourse-এ অংশ নিয়ে থাকেন তারা কথিত পূর্বধারণার বাহকবৃন্দের নিকট খানিকটা বোধহয় অস্পৃশ্যই থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র নামক একটি অবকাঠামোর মধ্যে থেকে চলচ্চিত্র শিল্প বা film industry-তে যেখানে দৃশ্যত বছরে কোটি কোটি টাকার লগ্নিপুঁজির ব্যবসা চলে। আর অদৃশ্যত, যা বাঙালির শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চাসহ 'সংযোগ মাধ্যম' হিসেবে ক্রিয়াশীল, তা নিয়ে যে কোনোরূপ জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রকল্প গ্রহণ আমাদের বিবেচনায় অবশ্যই যুগোপযোগী। উপরন্তু, চলচ্চিত্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি সাম্প্রতিককালের চলচ্চিত্র সম্পর্কে রীতিমতো 'কমিশন' গঠনপূর্বক এর কার্যক্রম তদারকি, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে এরূপ নজরদারিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম বহুপূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। কেননা, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সমাজের ওতপ্রোত ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ চলচ্চিত্রকে যেমন সমাজের প্রতিচ্ছবি বা reflection বলা হয়ে থাকে তেমনি চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রদর্শিত দৃশ্য বিষয় সমাজের ওপর নানারূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত যেখানে সংকোচের

বিহ্বলতাকে পাশ কাটাতে পারে না সেখানে চলচ্চিত্রের (এমনকি টেলিভিশনেও) প্রযুক্ত ভায়োলেন্সের বিশ্লেষণ স্বাভাবিক কারণেই আমাদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলতে পারে। কারণ, উগ্র যৌনতা, নির্মমতা ও হিংসাত্মক অপরাধের বিচিত্র বিভঙ্গের মধ্যেই ভায়োলেন্সের জন্ম-বৃদ্ধি এবং শেষ পর্যন্ত জনসমক্ষে প্রদর্শন। আরও স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে, অপরাধ, হিংসা, হত্যা ও যৌনতার প্রকাশই অধিকাংশস্থলে বাণিজ্য প্রভাবিত সাম্প্রতিককালের চলচ্চিত্রের মৌল বিষয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে যৌনতা এবং অপরাধ দৃশ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে নিঃসন্দেহে হলিউড-বলিউডীয়সহ যাবতীয় চাকচিক্যময় চলচ্চিত্র অঞ্চলের পরানুকরণ প্রবৃত্তির মাধ্যমে। বিচিত্র রূপ ও রীতির অপরাধের অনুষঙ্গে এদেশের চলচ্চিত্রের হিংস্রতার পাশাপাশি যৌনতাও যুক্ত হয়েছে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র মাধ্যমে যৌনতাকে অশ্লীলভাবে রূপায়ণেই নির্মাতাদের প্রবল মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে যে, সামাজিক সংস্কার অনুসারে অতি সামান্য ইতরবিশেষ শ্লীল বিষয়ও অশ্লীল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি, অনিষ্টকর না হলেও অনেক বিষয় কেন কুৎসিত বা অশ্লীল বলে মনে হয় মনোবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মনোযোগী হন। আমরা কেবল এরূপ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি যে, সকল সমাজেই নানা রকম ঃধনড়ড় প্রচলিত আছে এবং সেসব taboo লঙ্ঘন করা কষ্টসাধ্য। তবু কালে-কালান্তরে taboo-রও রূপান্তর হয়। পাশাপাশি মনে রাখা ভালো যে, এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর। প্রসঙ্গত স্বীকার্য যে, দেশাচার ভেদে চলচ্চিত্র মাধ্যমে যৌনতা প্রদর্শনের মাত্রাগত ভিন্নতাও বিদ্যমান। এর পশ্চাতে সেন্সর প্রথা সামান্য হলেও একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। হলিউডীয় সেন্সর প্রথা থেকে বাংলাদেশে বিরাজিত সেন্সর প্রথা একবারেই স্বতন্ত্র। আবার ইউরোপে প্রচলিত সেন্সর পদ্ধতি ভিন্নই শুধু নয় নামটিও ভিন্নতর—রেটিংস। সেন্সরশিপ বা রেটিংস যাই বলা হোক না কেন এ প্রথা প্রত্যেক সমাজেরই স্ব-স্ব সামাজিক বিধিবিধানের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে বিরাজিত সামাজিক রীতিনীতির বিবেচনার চেয়ে 'যে-কোনো উপায়ে' কিংবা বলা যায় 'রাখ-ঢাক' নামক কথিত প্রবাদের আশ্রয়ে শেষ পর্যন্ত সেন্সর প্রাপ্তিই যেন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। বর্ণিত রাখ-ঢাক করতে গিয়ে অনেক সময় চলচ্চিত্রের পর্দায় বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মোড়কে যা প্রদর্শিত হয় তা উত্তেজক চিত্রদৃশ্য বা visual image যা প্রকারান্তরে যৌন সুড়সুড়ি বৈ কিছু নয়। এরূপ দৃশ্যের সমাহার প্রচলিত ফর্মুলাকে অনুসরণ করেই চিত্রিত হয়।

হলিউড প্রবর্তিত রীতি-পদ্ধতি বলিউড বা বোম্বেকে যেমন প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে তেমনি ঢালিউড বা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রও উল্লিখিত উভয় প্রভাবে প্রভাবিত। তবে বলিউড যেমন স্বল্পমাত্রায় হলেও ভারতীয় জীবনকে তাদের চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত মারপিট দৃশ্যের অনুকূলে স্থান দিতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে পরানুকরণবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও মারামারির দৃশ্য নির্মাণে আমরা কখনো কখনো বাঙালিপনার পরিচয়ও দেখতে পাই। অন্তত মিতা পরিচালিত লাঠিয়াল (১৯৭৫) জাতীয় চলচ্চিত্র আমাদের গ্রামীণ জীবনসংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত 'ওয়েজ আনার্স স্কিম'র আওতায় এদেশে আমদানিকৃত থাইল্যান্ড-ব্যাংকক-চাইনিজ চলচ্চিত্র থেকে আমাদের চলচ্চিত্রে একধরনের মারামারি বা অ্যাকশন দৃশ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। এইসব এবং পূর্বোল্লিখিত হলিউডীয় চলচ্চিত্রের অ্যাকশন দৃশ্যকে বাংলাদেশের একশ্রেণির নির্মাতারা আদর্শ ভেবে বসে এবং তদ্রূপ চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোনিবেশ করে। ফলে এদেশীয় চলচ্চিত্রেও অ্যাকশন বিচিত্র রূপ ও রীতির আশ্রয়ে অনেকটা ভয়ঙ্কর সহিংস ও দুর্ধষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মাকড়শা, কালাখুন, আম্মাজান, ধর, শান্ত কেন মাস্তান, শীর্ষ সন্ত্রাসী, মাস্তানের দাপট, বাজার, স্বপ্নের ভালোবাসা, স্বপ্নের রাজা, রাগী, ক্ষমতার গরম, ক্রসফায়ার, কষ্ট প্রভৃতির ন্যায় শত শত চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত অ্যাকশন দৃশ্যসমূহের চিত্রায়ণ মানুষের সহিংস মনোভাব ও অপরাধ প্রবণতাকে উস্কে দেওয়ার মনোভঙ্গিকে প্রকট করে তোলে।

চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন মাধ্যমে যৌনতা, হিংসা, ষড়যন্ত্র ও হত্যা একটি বিশেষ স্থান জুড়ে ভায়োলেন্সের স্বরূপটিকে দাপটের সঙ্গে টিকিয়ে রেখেছে। এসবের সামষ্টিক স্থিতিকে এ কথায় ভাবনাস্ফীতি বা cinematic inflation বলা যেতে পারে। ভায়োলেন্সের অনুষঙ্গী হিসেবে প্রথমত যৌনতাকে বিস্তৃত পটভূমিতে স্থাপনপূর্বক আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্রে যৌনতা বিষয়ে আলোচ্য বক্তব্যকে 'যৌনতা ও চলচ্চিত্র' এই উপশিরোনামে বিভাজনপূর্বক প্রসঙ্গটিকে কমপক্ষে নিম্নলিখিত তিনটি স্তর-বিন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

ক. যৌনতার শারীরিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনঃস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি

বিষয়কে অবলম্বন করে যে সমস্ত মেডিকেল বা গণশিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, নৃতাত্ত্বিক চিত্র এমনকি গবেষণামূলক চিত্র নির্মিত হয় সেসব চলচ্চিত্র এই প্রথম স্তরের আওতাভুক্ত।

খ. আবার, একেবারেই এসবের বিপরীত প্রান্তে রয়েছে নারী-পুরুষের নানারূপ বিকৃত যৌন কামনা-বাসনার প্রত্যক্ষ, অনুপঙ্খ এবং সর্বোপরি নির্লজ্জ চিত্রায়ণ। বিচিত্র যৌন বিকৃতি যথা— সমকাম, আত্মমৈথুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষকাম, মর্ষকাম, ভ্যয়ারিজম, নরপশু মৈথুন প্রভৃতির প্রদর্শনপ্রিয় কিন্তু যথেষ্ট বিশ্বাস্য এবং পর্নোগ্রাফিক উপস্থাপন।

গ. উপরে বর্ণিত দুই শ্রেণির মাঝামাঝি সারিতে বিবেচনা করা যেতে পারে সাধারণ বা প্রচলিত কাহিনিচিত্রে নগ্নতা ও যৌনতার ধীরস্থির ভূমিকা। সাধারণত দেখা যায় যে, চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্বে এবং পরিচালকের মনস্তত্ত্বে প্রসঙ্গটি প্রায়শই ঘুরে ফিরে আসে। কাহিনিচিত্রে নগ্নতা ও যৌনতার রূপায়ণ অনেক সময় যেমন অসাধারণ শিল্পসুষমা, ব্যঞ্জনা আর নান্দনিক উত্তরণ নিয়ে এসেছে, তেমনি অনেকক্ষেত্রেই অশ্লীলতার অভিযোগে তুমুল বিতর্ক, প্রতিবাদ এবং সমালোচনারও জন্মদান করেছে। শ্লীলতা আর অশ্লীলতার অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত কখনো কোনো চলচ্চিত্রের 'ভাগ্য' যেমন বদলে দিয়েছে তেমনি কোনো চলচ্চিত্রের জন্য বয়ে এনেছে সীমাহীন 'দুর্ভোগ'ও। যৌন চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রে যৌন প্রতিন্যাস ও চলচ্চিত্রে যৌনতার মধ্যে বিরাজিত সেই পার্থক্য, পর্নোগ্রাফি, ইরোটিকা ও সাইকো সেক্সুয়াল পোরট্রেচারের মধ্যে সেই পার্থক্য। যেমন— ব্রিটিশ ংঢ়ধহশরহম ভরষসং আর পাসোলিনির হানড্রেড টুয়েন্টি ডেজ অব সডম আর বার্গম্যানের সাইলেন্স।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে সম্যক সচেতন ব্যক্তিমাত্রেরই ধারণা স্পষ্ট যে, চলচ্চিত্রে নগ্নতার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। পাশাপাশি বর্ণিত গোষ্ঠীর এই ধারণাও স্পষ্ট যে, নগ্ন নারীমূর্তি দর্শনে যৌন কামনা জাগবেই এ ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধ নয়। সাধারণত বিবেচনা করা হয় যে, মূল ফ্রেমের কতটা অংশ জুড়ে নগ্নতা ও যৌনতার রসধমব বা চিত্ররূপটি চিত্রিত করা হয় এবং কতটা সময় ধরে তা দর্শকের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় এ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই উক্ত রসধমব বা চিত্ররূপ দর্শকের মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফ্রেমের আকার-আয়তন এবং স্থিতি-সময়সহ ব্যাকগ্রাউন্ড সংগীত বা আবহসংগীতের ওপরও এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি নির্ভরশীল।

ভায়োলেন্সের অপর অর্থ যদি করা হয় 'নিপীড়ন' তবে এর অজস্র উদাহরণ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করা যাবে। মহম্মদ হাননান পরিচালিত রাঙা বউ চলচ্চিত্র থেকে নিষ্ঠুরতা ও যৌনতার একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। দৃশ্যটি এরূপ যে, নায়ক (স্বামী) তার নায়িকাকে (স্ত্রীকে) নিয়ে শহরে গিয়েছিল আনন্দ করার জন্য। কিন্তু মাঝপথ থেকে নায়ক তাকে নিয়ে ফিরে আসে। ক্রুদ্ধ নায়কের আচরণ নিম্নরূপ :

স্বামী স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে : তোকে নিয়ে শহরে গিয়েছিলাম, হোটেলে খাব, মজা করব,

আনন্দ করব

ভয়ঙ্কর চিৎকারে : কেন হলো না?

স্ত্রীকে প্রহাররত অবস্থায় : শুধু তোর জন্য, শুধু তোর জন্য স্ত্রীর চোখ চুম্বন করে : এই সুন্দর ঠোঁটের জন্য প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে স্ত্রীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে সংজ্ঞাহীন করে স্ত্রীকে

আলিঙ্গনরত অবস্থায় : তোমার এই রূপ, যৌবন, সৌন্দর্য সব আমার আজ থেকে তোমার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারবে না হুঙ্কার দিয়ে চিৎকার করে ওঠে : কেউ না।

উল্লেখের অবকাশ রাখে না যে, বর্ণিত দৃশ্যটি একদিকে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের নির্মমতাকে প্রকাশের মাধ্যমে পুরুষের বিকৃত আনন্দলাভের বিষয়টি মূর্ত হয়ে ওঠে। স্ত্রীকে অন্ধকার ঘরে সংজ্ঞাহীন ও রক্তাক্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত রেখে সামান্যতম অপরাধবোধে আক্রান্ত হওয়া তো দূরের কথা জমিদার পুত্রকে অত্যন্ত শান্ত ও তৃপ্ত দেখায়। নারীকে ইচ্ছে মতোন নিপীড়নের মধ্যেই বিকৃত মানসিকতার পুরুষরা সুখ অনুভব করে। এই রকম একটি নির্যাতনমূলক দৃশ্যের পরপরই নৃত্যসহযোগে একটি গানের উপস্থাপন রয়েছে রাঙা বউ চলচ্চিত্রে। বিকৃতকাম স্বামী স্ত্রীকে সংজ্ঞাহীন রেখে এসে সমাহিত শান্ত মনে সেই স্ত্রীকেই নৃত্যরতা ভেবে কল্পনা করে এই গান, যা প্রেমমূলক আবহ না ছড়িয়ে এই যুগলের শিকারি ও শিকারের অবস্থানকে প্রকট করে। বর্ণিত গানের সিকোয়েন্সে কথাগুলো এই রকম : হিংস্র চিৎকার করে স্বামী : ঐ মাইয়া গা কইতাছি, গা নাচরে মাইয়া কোমড় দুলাইয়া নাচরে মাইয়া মন ভুলাইয়া স্বামীর এই হিংস্র ভঙ্গির প্রতিউত্তরে স্ত্রী উল্লসিত হয়ে নাচেআর নাচের সঙ্গে সঙ্গে গায় : তরকারিতে লবণ বন্ধু? থাকবে যেমন চিরকাল মুখে কাঁচামরিচ পড়লে/ লাগবে যেমন জিহ্বায় ঝাল

তোমার প্রেমে এমনি ঝাল/ কইলজা গুরদা ছিঁড়া যায়

সংগীতের এই বাণী (?) যিনি রচনা করেছিলেন বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিনিও বিকৃত যৌনতাকে একদিকে যেমন সমর্থন করেন অন্যদিকে

তেমনি নারীর ওপর পুরুষের ভায়োলেন্সকে বা নির্যাতনকেও সরাসরি সমর্থনে ভূমিকা গ্রহণ করেন।

'চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন মাধ্যমে পরিবেশিত সহিংসতা বা অপরাধ সামাজিক সহিংসতা সৃষ্টিতে কীরূপ ভূমিকা রাখে'— শীর্ষক প্রশ্নের উপর আলোচনা বিগত শতাব্দী জুড়েই বিতর্ক সৃষ্টি করে রেখেছিল। বর্তমান শতাব্দীও এই বিতর্ক থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আবার একই বিষয়ে রচিত প্রায় ২৫০০ গ্রন্থ এবং সহস্র গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রকল্প সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে চলেছে। উত্তর সন্ধান করে চলেছে ঐসব বই-পুস্তক বা গবেষণায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন-সহিংসতার সঙ্গে মানব-আচরণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের বিষয়েও। এরকমই এক গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে, যেসমস্ত শিশুরা টেলিভিশন বা চলচ্চিত্র মাধ্যমের সহিংসতা দেখে দেখে অভ্যস্ত— পরবর্তীকালে তাদের দ্বারা সামাজিক অপরাধ সংঘটন সহজ বিষয়ে পরিণত হয়। উক্ত গবেষণাপত্র থেকে আরও জানা যায় যে, By the time the average U.S. child starts elementary school he or she will have seen 8,000 murders and 100,00 acts of violence on TV. শ্রেণি-বর্ণ-নির্বিশেষে মাধ্যম-সহিংসতা যে-কোনো পরিবারের যে-কোনো শিশুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত অপর এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, যেসব মেয়ে শিশুরা বাল্যে মাধ্যম-সহিংসতাপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের অধিকাংশই স্বামীর সঙ্গে হাতাহাতি-মারামারি এবং জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ির ঘটনায় জড়িত। আর যেসব ছেলে শিশু গণমাধ্যমে সহিংস ঘটনা দেখে অভ্যস্ত তারা সহজেই স্ত্রীর উপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এতদদৃষ্টে মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, Violent Tv show increases a little-bit the likelihood of a child growing up to be more aggerssively. পাশাপাশি কানাডীয় অপর এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ১৮ বছর বয়সের মধ্যে সে দেশের শিশু/কিশোররা ৩২,০০০ হত্যা দৃশ্য এবং ৪০,০০০ হত্যার জন্য উদ্যত হওয়ার দৃশ্য টেলিভিশন বা চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে। যদিও এসব হত্যা খুন বানানো-অবাস্তব, সরলিকৃত, চাকচিক্যময় সাজানো এবং অতিরঞ্জিত তবু বাস্তবের সমাজজীবনে ধীর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এরূপ মাধ্যম-সহিংসতা নেতিবাচক প্রভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আমাদের দেশেও এরূপ গবেষণা জরুরি।

বিজ্ঞাপনেও ভায়োলেন্স

টেলিভিশন ক্লোজ-আপ মাধ্যম বলে এবং ইচ্ছে মতো এর নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে মানবজীবনে চলচ্চিত্রের চেয়ে টেলিভিশনের গুরুত্ব অধিক। নিজের গৃহে পছন্দ মতো সময়ে পছন্দ মতো অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায় বলেও এই মাধ্যমটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব বহন করে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, টেলিভিশন আমাদের 'কী দেখায়'? এরূপ প্রশ্নের প্রথম সচেতন উত্তর নিঃসন্দেহে বিজ্ঞাপন, দ্বিতীয়ত বিজ্ঞাপনপুষ্ট নাটক-সংগীত-বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এবং সাম্প্রতিককালের সংযোজন বিভিন্নরূপ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'প্রতিভা' অনুসন্ধান। মনে রাখা উচিত, এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণত এক কর্পোরেট অর্থনীতির কারসাজি। আর সর্বশেষ পর্যায়ে চলচ্চিত্রের অবস্থান অর্থাৎ টেলিভিশন মাধ্যমে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র। বিজ্ঞাপনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম টেলিভিশন। দৃশ্য-শব্দ-গতি প্রভৃতির সমাহারে নিজেকে সাজিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে টেলিভিশন অধুনা পৌঁছে গেছে মানুষের ড্রয়িং রুমে এবং সেখান থেকে শোবার ঘরেও। টেলিভিশন দৃশ্য ও শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে সহজেই যে-কোনো পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা বা ভোক্তার মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই মাধ্যম বিক্ষিপ্ত দর্শক-শ্রোতার কাছে একই সাথে এবং তাৎক্ষণিকভাবে উৎপাদিত নতুন ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে বার্তা পৌঁছে দিতে অত্যন্ত কার্যকর। টেলিভিশন তাৎক্ষণিকতার এই যে সুবিধা প্রদান করছে তা বিজ্ঞাপনের অন্যান্য মাধ্যম অর্জন করতে অক্ষম। সমগ্র বিশ্বে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তাই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে একে সাধারণত বহুক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিজ্ঞাপনদাতাদের মূল লক্ষ্য যেসব অর্থনৈতিক-সামাজিক শ্রেণির মানুষ তাদের প্রত্যেক উপশ্রেণি, উপগোষ্ঠীর কাছে টেলিভিশনের দরজা বা স্ক্রিন খোলাই আছে। অতএব ভৌগোলিক আর শ্রেণিগত বিস্তৃতি এর বিশাল, অবশ্যই তা টেলিভিশন নির্বাচনকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। শব্দের সমাহার তার মনোহারিত্ব ছাড়াও পণ্য পরিষেবা, গ্রাহক-পরিবেশ মূলত সবকিছুকেই খুব বাস্তবভাবে উপস্থাপনের সুযোগ দেয় টেলিভিশন।

বিজ্ঞাপনের বাস্তব অথবা বাস্তবাশ্রিত স্বপ্নকে চোখের সামনে ধরে দিতে পারে টেলিভিশন যা চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমই পারে না। কিন্তু টেলিভিশনের তুলনায় চলচ্চিত্র তৈরি করা সময় ও খরচ সাপেক্ষ এবং মাধ্যম হিসেবেও এর বিস্তৃতি সীমাবদ্ধতার কারণে একে টিভির তুলনায় পেছনেই থাকতে হয়। এমন অনেক বিজ্ঞাপন আছে যেগুলো ডেমনস্ট্রেশনের ওপর গভীর জোর দেয়। অর্থাৎ কিছু করে দেখাতে হবে না হয় কীভাবে কাজ করে তা দেখাতে হবে। দুটি জিনিসই আকর্ষণীয় করে টেলিভিশনের আশ্রয়ে বিজ্ঞাপন খুব চমৎকারভাবে সম্পন্ন করতে পারে বলে টেলিভিশনের বিকল্প মাধ্যম আর নেই।

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনসমূহ বিশ্লেষণ করলে সেখানে ভায়োলেন্স ক্বচিৎ দেখা গেলেও যৌনতা বিজ্ঞাপনের এর নির্ভরশীল আশ্রয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে। আর নারীকে সেসব বিজ্ঞাপনে কতই না বিচিত্র ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে নারী যেন বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট করা পণ্যটিরই সমান্তরাল পণ্যে পরিণত হয়ে ওঠে। তাই সাবান, পেস্ট, টয়লেট ক্লিনার থেকে বিছানার ফোম, দিয়াশলাইয়ের বাক্স, শিশুখাদ্য প্রভৃতি সবকিছুরই মূর্তায়ন করা হয় নারীকে উপজীব্য করে এবং নারীকে যৌন সিম্বল হিসেবে বিবেচনা করেই। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপনচিত্রে যৌনতা জাগাতে স্বল্পায়তনের পোশাকি নারীরই প্রাধান্য বেশি। এর লৈঙ্গিক কারণ স্পষ্ট এবং তা হলো মেল-গেজ। যেখানে সব সময়ই এই ধরনের উপস্থাপনে নারীর পোশাক-শরীর এক 'প্রপস' হিসেবে কাজ করে মাত্র। কিন্তু আমাদের সম্মুখে এরূপ প্রশ্ন উঁকি দেয় বটে যে, নারী কী পোশাকে লেট-নাইট পার্টিতে উপস্থিত হবেন, আর বিজ্ঞাপন চিত্রমালা তাকে, তার দেহকে পোশাককে যৌন আবেদন জাগাতে কীভাবে ব্যবহার করবে তা রিয়ালিস্টিক কি না, তা সেন্সরড হওয়া উচিত কি না, নির্মাতা— ক্লায়েন্ট নারীকে যৌন প্রতীকরূপে ব্যবহার করায় নারী এখানে সিগনিফায়ার না হয়ে সিগনিফায়েড হয়ে পড়ে কোনো বিশেষ সাইন বা তাৎপর্য তৈরি করে কি না— যা পুরুষের অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনাকে উপস্থাপন করে। এক কথায় সমালোচকের ভাষায় : What is this place, this bodz, from which women speak so mutely?- ইত্যাদি অবশ্যই বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

চলচ্চিত্র মাধ্যমে অপরাধ ও যৌনতা

কেস স্টাডি-১ : চন্দ্রকথা

হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত চন্দ্রকথা (২০০২) চলচ্চিত্রে সৃষ্ট সহিংসতা বা হিংস্রতার নমুনা প্রথাগত বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের প্রচলিত কল্পনা বা ইমেজকেও হার মানায়। এ চলচ্চিত্রের দৃশ্যধারণ প্রকৃতিও নিষ্ঠুরতায় ভারাক্রান্ত। চন্দ্রকথার এক দৃশ্যে দেখি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির সরকার সাহেব (আসাদুজ্জামান নূর) স্ত্রী চন্দ্রকে (শাওন) চাকর দিয়ে চাবুক-পেটা করায়— নিজে বসে থাকে পাশের ঘরে। তার সম্মুখে জলতরঙ্গের বাটি। চাবুকের এক একটি আঘাতের শব্দ শুনে সরকার সাহেব একটি করে বাটি ওঠান। এভাবে একপাশে চাবুকের আঘাতের পর আঘাতের শব্দ—অন্যপাশে বাটির ওপর বাটির পাহাড় জমে যায়। পরের দৃশ্যে দেখা যায় সরকার সাহেব নিজেই হিংস্রতা সংঘটনে ব্রতী হন। সরকার সাহেব বসে আছেন—তারই পাশে বসা স্ত্রী চন্দ্র। চন্দ্রর হাত টেবিলের ওপর ছড়ানো। পাশে জলতরঙ্গের ওঠানো বাটির পাহাড়। চন্দ্রর হাত চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত। ধীর শান্তভাবে সরকার সাহেব চন্দ্রর হাতে হাত বোলায়। রক্তাক্ত আঙুলে টোকা দিয়ে বলে : 'বাহ! তোমার আঙুলগুলো খুব সুন্দর। আবার যদি আমার নিষেধ অমান্য কর, আমি তোমার আঙুলটা কাইট্যা ফেলব। আবার অপরাধ করলে আরেকটা...।' এই সংলাপের শেষে সরকার সাহেবকে দেখি চন্দ্রর রক্তাক্ত আঙুলে চুমু খেতে। অর্থাৎ ভায়োলেন্স সৃষ্টিতে নৃশংসতা ও যৌনতা যেন একে অপরের পরিপূরক। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন দর্শক ভেবেছিল যে, হুমায়ূন আহমেদের মতো পরিচালক অন্তত নিষ্ঠুরতাকে তার চলচ্চিত্র বিষয়ের উপাদানে পরিণত করবেন না। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ফলে মহম্মদ হাননানের সঙ্গে তার তুলনাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। মহম্মদ হাননানের রাঙা বউ (২০০৪) চলচ্চিত্রের সঙ্গে চন্দ্রকথার মিল আবিষ্কার সম্ভব। বিশেষত চন্দ্রকথার মতোই যখন দেখি রাঙা বউ ছবিতে জমিদার (হুমায়ুন ফরীদি) অবাধ্যতার জন্য স্ত্রীকে (ঋতুপর্ণা) চাবুক পেটা করে। অবশ্য এক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল

টেলিভিশন দৃশ্য ও শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে সহজেই যে-কোনো পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা বা ভোক্তার মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই মাধ্যম বিক্ষিপ্ত দর্শক-শ্রোতার কাছে একই সাথে এবং তাৎক্ষণিকভাবে উৎপাদিত নতুন ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে বার্তা পৌঁছে দিতে অত্যন্ত কার্যকর। টেলিভিশন তাৎক্ষণিকতার এই যে সুবিধা প্রদান করছে তা বিজ্ঞাপনের অন্যান্য মাধ্যম অর্জন করতে অক্ষম। সমগ্র বিশ্বে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তাই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে একে সাধারণত বহুক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিজ্ঞাপনদাতাদের মূল লক্ষ্য যেসব অর্থনৈতিক-সামাজিক শ্রেণির মানুষ তাদের প্রত্যেক উপশ্রেণি, উপগোষ্ঠীর কাছে টেলিভিশনের দরজা বা স্ক্রিন খোলাই আছে। অতএব ভৌগোলিক আর শ্রেণিগত বিস্তৃতি এর বিশাল, অবশ্যই তা টেলিভিশন নির্বাচনকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। শব্দের সমাহার তার মনোহারিত্ব ছাড়াও পণ্য পরিষেবা, গ্রাহক-পরিবেশ মূলত সবকিছুকেই খুব বাস্তবভাবে উপস্থাপনের সুযোগ দেয় টেলিভিশন। বিজ্ঞাপনের বাস্তব অথবা বাস্তবাশ্রিত স্বপ্নকে চোখের সামনে ধরে দিতে পারে টেলিভিশন যা চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমই পারে না

চন্দ্রকথায় পেটায় চাকর এখানে নায়ক নিজে। আর চন্দ্রকে চুম্বনের মতো রাঙা বউকেও জমিদার চুম্বন করতে থাকে। তবে চন্দ্রকথার সরকারের তুলনায় রাঙা বউয়ের জমিদার নিষ্ঠুর শান্ত স্বভাবের নয়—অনেকটাই পাগল ও উন্মাদপ্রায়।

কেস স্টাডি-২ : মাস্তানের দাপট

গাজী জাহাঙ্গীর পরিচালিত মাস্তানের দাপট চলচ্চিত্রের শুরুতেই দেখি তাজু চোর (হুমায়ুন ফরীদি) গ্রামের এক বিধবা মহিলা গৃহস্থের নারিকেল গাছ থেকে ডাব চুরি করতে উদ্যত হয়। কিন্তু গৃহস্থ মহিলা টের পেয়ে অকুস্থলে বাতি জ্বালিয়ে উপস্থিত হলে তাজুর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাজুকে চিনে ফেলে মহিলা তার উদ্দেশ্যে গাল-মন্দ করতে থাকে। তাজু ও তার সাগরেদ আড়ালে দাঁড়িয়ে মহিলার গাল-মন্দ শোনে। সাগরেদের 'কিছু একটা ব্যবস্থা' করার কথা বলে আকুতি জানালে তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতিশ্রুতি মতো তাজু অপরাপর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সেই মহিলার ঘুমন্ত সন্তানদের ওপর হামলা চালায়। সকলকে ধরে নিয়ে আসে এক নদীর ধারে। মহিলার এক একজন শিশু সন্তানকে তাজুর সাগরেদরা এক একটি ড্রামের ভিতর ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। তারপর মহিলার নিকট থেকে জোরপূর্বক দলিলে স্বাক্ষর গ্রহণ করে। প্রথমত মহিলা রাজি না হওয়ায় সাগরেদদের নির্দেশ দেয় : 'অই, একটা ড্রাম নদীতে ফালা'। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাসহ একটি ড্রাম নদীতে ফেলে দেয় তাজুর শিষ্যরা। অসহায় মা তার অপর সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তাজুর পায়ে পড়ে। দলিলে স্বাক্ষর করে। স্বাক্ষর হওয়ার পর তাজু বলে ওঠে : 'এই পৃথিবীর সবাই বাইচ্চা থাকতে চায়। কেউ মরতে রাজি না। তবু মরতে হয়। তোকেও মরতে হবে। কারণ তুই বাইচ্চা থাকলে সম্পত্তির দাবি নিয়া কোর্টে মামলা ঠুইক্কা দিবি। মামলা মানেই কোর্ট-কাচারি, থানা-পুলিশ... হায় আল্লারে... (ভয়ঙ্কর শব্দে চিৎকার করে ওঠে) নামটা (পুলিশের) মনে করতে চাই না। মনে করাইয়া দিলি হারামজাদি... (বলে মহিলার পেটের ভিতর ছুরি ঢুকিয়ে দেয়)।' পরে মহিলার লাশ একদিকে নিয়ে যায় সাগরেদরা এবং বাচ্চাসহ ড্রামগুলো একটা একটা করে নদীতে ফেলে দেয়।

একই ছবির অন্য একটি দৃশ্যে আরও একটি মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্য আছে। ঘটনাচক্রে তাজু সম্পন্ন এক মওলানা সাহেবের বিশ্বস্ত লোকে পরিণত হলে তিনি তার মেয়েরে তাজুর সঙ্গে বিয়ে দেয়। আর সমস্ত সম্পত্তি তাজুর নামে লিখে দিয়ে হজ করতে চলে যান। হজ থেকে ফিরে মওলানা সাহেব জানতে পারেন যে, তাজু তার সম্পত্তি অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিয়েছে। ফলে তাজুর উপর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে পুলিশে দেবে জানালে প্রচণ্ড চিৎকারে তাজু শ্বশুরের দিকে অগ্রসর হতে হতে গর্জন করে বলে ওঠে : 'পুলিশের কথা মনে করাইয়া দিলি ক্যান শুয়রের বাচ্চা?'— বলে তাকে কয়েক তলা উঁচু ভবন থেকে নিচে ফেলে দেয়।

চলচ্চিত্রের ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে যায় অনেক দূর। তাজুর সন্তান একসময় বড় হয়। পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে সাবালক (!) নায়কের ঘটনাক্রমে সাত বছরের ব্যবধান। শিশুসন্তানেরা বেশ তাগড়া-ধরনের মাংসল যুবক-যুবতীতে পরিণত। তারা নানারকম অ্যাকশনে অংশগ্রহণ করে। এসব অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় বা মারামারি করানোর সময় পরিচালকেরা তাদেরকে সাদা পোশাক সরবরাহ করে। কারণ রক্তপাতের দৃশ্যে সাদা পোশাকই বেশ মানানসই হয়। নায়ক রুবেল মারামারি করার সময় প্রতিপক্ষ তার পেটের ভিতর দীর্ঘ ছুরি ঢুকিয়ে দিলে রক্তাক্ত সাদা পোশাক ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্সের স্বরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার, সাদা পোশাক কেবল খুন-জখমের জন্য নয়— নায়িকাকে হুস্বায়তনের সাদা পোশাক পরিয়ে পরিচালকেরা মনের আনন্দে ভিজিয়ে নাচিয়ে নিজেদের জিভসহ একশ্রেণির দর্শকের রসনাও পূর্ণ করে। কৃত্রিম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নাচে আর গায় : 'ভালোবেসে শেষে বন্ধু দাগা দিয়ো না'— জাতীয় গান গেয়ে নায়কের মন ভোলায়। মন ভুলে দর্শকদেরও।

কেস স্টাডি-৩ : জালালের গল্প

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রধারার প্রেক্ষাপটে আবু শাহেদ ইমন পরিচালিত জালালের গল্প (২০১৫) স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র। তবে বাণিজ্যিক তথা ফর্মুলা চলচ্চিত্রের মতোই এই চলচ্চিত্রের গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্য করা সম্ভব হয়েছে। তিন পর্বে জালালের গল্প-এর উপস্থাপন ও কাহিনিতে ভায়োলেন্সের নানামাত্রিক রূপ পরিদৃষ্ট হয়। এই চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বে দেখা যায়, পরিচয়হীন শিশুর পাতিলের ভেতর আবিষ্কার। গ্রামের লোকজনই পাতিলের ভেতরে ভেসে আসা মানবশিশুকে আবিষ্কার করে। এই পর্বের শেষে দেখা যায়, গ্রামের লোকজন শিশুটিকে 'অপয়া' তথা 'কুফা' হিসেবে চিহ্নিত করে। অতঃপর জালালকে আবারও নদীর পানিতে সেই বড় পাতিলে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

প্রথম পর্বের সমাপ্তির পর জালালকে দেখা যায় অন্য আরেক পরিস্থিতিতে। জালাল তখন ৭-৮ বছরের শিশু। এই পর্বে জালাল কৈশোরে পা দিয়েছে মাত্র, সে এক নিঃসন্তান ভূস্বামীর আশ্রিত সন্তান। কিন্তু নিঃসন্তান ভূস্বামীর কাছেও সে আশ্রিতের মতোই নিগৃহীত। লক্ষ্য করা যায়, জালাল পরিস্থিতির শিকার হয়ে অপরাধ জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ

অপরাধকেন্দ্রিকতা ও পরিস্থিতির শিকার এক কিশোরের প্রতিচ্ছবিই এই পর্বে প্রস্ফুটিত। আর ঘটনাক্রমে পুনরায় তাকে ভেসে যেতে হয় নদীতে। এই পর্বে একজন শিশুর সামনে ঘটে যাওয়া পরিণত বয়সি মানুষের অপরাধসমূহ এবং একজন শিশুকে বস্তার ভেতর বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যে ভায়োলেন্স, যৌনতা ও অপরাধের বহুমাত্রিক চিত্র দেখা যায়; যা ইতঃপূর্বে মূলধারার চলচ্চিত্রেও দেখা যায়নি।

চলচ্চিত্রের তৃতীয় পর্বে দেখা যায়, যুবক জালাল খুনি সজীবের সান্নিধ্যে লালিত হয়ে সেও তার দলে কাজ করে। সজীব যখন-তখন, যাকে-তাকে কুপিয়ে কিংবা ইটের ভাটায় পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধা করে না। দেখা যায়, যাত্রার অভিনেত্রী শিলাকে ধরে নিয়ে আসা হয় সজীবের কথা মতোন। অতঃপর আটকে রেখে জালালের সামনেই সজীব শিলার সাথে খারাপ আচরণ করে। দিনের পর দিন তার বিভিন্ন কপট অভিনয়ে মেয়েটি সজীবের বশ্যতা মেনে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই শিলা গর্ভবতী হয়। ঘটনাক্রমে শিলাকে এক নির্জন স্থানে পাঠানো হয়; সাথে রাখা হয় জালালকে। জালাল শিলার সব ধরনের সেবা-যত্ন করে যায়। এরই সূত্র ধরে জালাল ও শিলার মাঝে একধরনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু সন্তান প্রসবের সময় শিলা মারা যায়। আর শিলার সন্তানকে লালন-পালন করে জালাল। অন্যদিকে নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে জালালের পালিত পিতা সজীব। নির্বাচনের আগে যেন কোনো গুজব কিংবা কথা না ছড়ায় সে জন্য তার লোকজনদের পাঠায় শিলার সন্তানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তারা এক ভোরে শিলার শিশুসন্তানটিকে কৌশলে নিয়ে আসে এবং একটি পাতিলে করে ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। জালাল তা দেখতে পেয়ে নদীর জলে লাফিয়ে পড়ে। এভাবেই চলচ্চিত্র কাহিনি পরিণতি পায়। লক্ষণীয় যে, এই পর্বেও অপরাধ আর ভায়োলেন্সের নানা চিত্র প্রতিফলিত।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশীয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন মাধ্যমের নানা অনুষ্ঠানে ভায়োলেন্সসহ তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রতিরোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা :

১. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাতাদের জন্য সমাজ-অনুকূল ন্যায় ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. বাঙালির জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং নানা আন্দোলন-সংগ্রাম অবলম্বনপূর্বক বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শজনিত ও প্রেরণাসঞ্জাত অন্তত ১০টি চলচ্চিত্র বছরে নির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট থাকা জরুরি। পাশাপাশি এসব চলচ্চিত্র নিয়ে অপরাপর গণমাধ্যম তথা টেলিভিশনে আলোচনা-সমালোচনার ব্যবস্থাকরণ।

৩. টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়েও সপ্তাহে অন্তত একদিন বিতর্কমূলক বা 'টক-শো' জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে প্রাইভেট চ্যানেলসমূহকে বাধ্যকরণ। এই অনুষ্ঠানে সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিকব্যক্তিত্ব এমনকি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে বিশেষজ্ঞ বক্তব্য প্রদানের সুযোগদান।

৪. বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিনির্ভর ও ভায়োলেন্সবিহীন গল্পভিত্তিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থাকরণ। প্রসঙ্গত মনে রাখা জরুরি যে, কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তির পর্যাপ্ত জ্ঞানলাভের পূর্ব পর্যন্ত স্পেশাল ইফেক্টনির্ভর এসব চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিবর্তে ডিজনি ওয়াল্টের চলচ্চিত্রসমূহ টেলিভিশন মাধ্যমে প্রদর্শন।

৫. চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ভায়োলেন্সের ফলাফলজাত দেশি-বিদেশি গবেষণাসমূহের ফলাফল নিয়ে প্রাইম টাইমে টেলিভিশন মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানের সম্প্রচারকরণ।

৬. বর্তমানে টেলিভিশন মাধ্যমই যেহেতু সকল বয়সি দর্শকের ন্যায় শিশু-কিশোরদেরও শিক্ষা ও বিনোদনের আশ্রয়স্থল সে বিবেচনায় বাংলা সাহিত্য এমনকি বিশ্বসাহিত্যের সৃষ্টিশীল রচনাসমূহ শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে সিরিয়াল ফিল্ম বা ধারাবাহিক চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সকল শিশুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি টেলিভিশন চ্যানেলে তার প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ।

৭. জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়নকালে চলচ্চিত্রে অপরাধ দৃশ্যের চিত্রায়ণ তথা হত্যা-হিংসা-হিংস্রতা কিংবা যৌনতা প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান।

পাশাপাশি প্রণীত নীতিমালা লঙ্ঘিত হলে তার ফলাফল সম্পর্কেও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

৮. চলচ্চিত্র মাধ্যমের ন্যায় টেলিভিশন চ্যানেলসমূহের ওপরও তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নজরদারি ও সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। বিশেষত টেলিভিশন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্র সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বেসরকারি চ্যানেলগুলো নীতিমালা অনুসরণ করে কি না তা পর্যবেক্ষণ।

৯. ভায়োলেন্স, হিংস্রতা, সহিংসতা, হত্যা, খুন বা যৌনতায় পূর্ণ চলচ্চিত্রসমূহের ওপর বিশাল অঙ্কের ট্যাক্স আরোপ করার ব্যবস্থাগ্রহণ পাশাপাশি সমাজঘনিষ্ঠ ও জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এসব ছবি ট্যাক্স-ফ্রি করা যেতে পারে। প্রথমত এটি সম্ভব না হলেও অন্তত সর্বনিম্ন রেটে এসব চলচ্চিত্র থেকে নেওয়া যেতে পারে।

১০. সমাজ ও জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্রসমূহের একটি তালিকা প্রণয়নপূর্বক প্রতিটি সিনেমা হল-এ মাসে একদিন সাধারণের জন্য ফ্রি-চলচ্চিত্র প্রদর্শন। প্রথমত এটি জেলা শহরভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে।